সৌমিত্রকুমার চ্যাটার্জী

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ যাত্রা পালাতে যখন

বাংলার যাত্রা মহলে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব এক বিশেষ ঘটনা। বাঁধা ছক ভেঙে ভিন্ন ধারাতে যে যাত্রা হতে পারে তার একটা নতুন দিক আমাদের সামনে উন্মোচিত হল। আমরাও ভাবতে শিখলাম ছোটো ছেলেমেয়েদের নিয়ে লোকনাট্য বা যাত্রা হতে পারে। তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিলেন শুধু বড়রা নয় ছোটোরাও যাত্রা শিল্পী হতে পারে। তাদের মতো করে তাদের জন্য পালা রচনা করে আমাদের যাত্রা মহলকে শুধু সমৃদ্ধ করলেন না ছোটোদের মান্যতা দিলেন। এর আগে এভাবে আর কোনো পালাকার ভাবেননি।

'দশ-এগারো বছর ছবি আঁকিনি। ...কী জানি কেন মন বসতো না ছবি আঁকতে। নতুন নতুন যাত্রা পালা লিখতুম, ছেলেদের নিয়ে যাত্রা করতুম, তাদের সাজাতুম। নিজে অধিকারী সাজতুম, ফুটো ঢোল বাজাতুম, স্টেজ সাজাতুম। বেশ দিন যায়।'

'জোরাসাঁকোর ধারে' বইটিতে রয়েছে কখন কেন যাত্রাতে মন দিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর এই যাত্রা প্রীতি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। পারিবারিক পরিমণ্ডল যেমন ছিল তেমনি তিনি ব্যক্তিগত জীবনে খাঁটি দেশজ শিল্পের ধারক ও বাহক। সেখান থেকে তিনি যে যাত্রাতে আসবেন এটাই স্বাভাবিক। ১৯৩৪ সাল। তিনি পাকাপাকিভাবে যাত্রা পালা রচনাতে মন দিলেন। যদিও এর আগে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণাতে কবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' থেকে ছোটোদের উপযোগী করে সরল গল্প 'শকুন্তলা' লিখেছেন। 'ক্ষীরের পুতুল' লেখা হল কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর রূপকথা সংগ্রহের খাতার একটি গল্পকে কেন্দ্র করে। যে সময় শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ পালা রচনা করতে এলেন সে সময় আমাদের পালার একটা আদল নির্মাণ হয়ে গেছে। বাণিজ্যিকভাবে পালা উতরে যাবার পথে। বেশ কয়েকজন পালাকার প্রতিষ্ঠিত এবং সুনামের সাথে পালাকে সচল রাখার দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁরা চাইছেন বাংলার লোক সংস্কৃতি—বাঁচুক স্বমহিমায় এবং আধুনিক ও সমৃদ্ধ হোক। এদের মধ্যে—মতিলাল রায়, ঠাকুরদাস দত্ত (পাঁচালীওয়ালা), পঙ্কজভূষণ কবিরত্ন, বিপ্লবী পালাকার মুকুন্দদাস, কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, এবং পালা সম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে অন্যতম। এই সব গুণী মানুষদের অসম্ভব প্রতিভা বাংলার যাত্রাকে বিবর্তনের পথ ধরে বাঁচিয়ে রেখেছিল ইংরেজী থিয়েটার ও শৌখিন থিয়েটার এবং আরো পরে সাধারণ রঙ্গালয়ের থিয়েটারের দাপটের হাত থেকে। দার্শনিক লংফো এক জায়গাতে—বলছেন 'Genius is infinite painstaking' একদম ঠিক কথা সহজাত শক্তির সাথে সাধনার মিলন হলে তবেই প্রতিভার জন্ম হয়। এনারা সেই গোত্রের মানুষ অবশ্যই ছিলেন। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে আমাদের মনে একথা ক্রমাগত ১০০ ভাগ সত্য হয়ে বাজে। একটা কথা আমাদের মানতে হবে এনারা একটা দুরূহ কাজ সমাধা করছেন। তখন ইংরেজ রাজত্বে অনেক কিছুর মতোই আমাদের

দেশজ—সংস্কৃতিও ধ্বংসের পথে। তাকে বাঁচানো দরকার আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে। যাত্রা লোক শিক্ষা দেয় একথা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি হিসাবে বহুকাল ধরে বিবেচিত। পুরান ও লোক সাহিত্যের নির্যাসে লোকনাট্য বা যাত্রা নির্মিত। যাত্রার সাবলীল অভিনয় ও ভাবনার প্রকাশ প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি সংস্কারের জন্ম দেয়। যা ক্রমে একটি জাতির সংস্কৃতি হয়ে ওঠে। সমাজ জীবনে যাত্রার গুরুত্ব শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকেও ভাবিয়েছে। এবং উৎসাহী হয়েছেন পালা নিয়ে কিছু করতে। তা নাহলে জীবনের শেষ প্রান্তে—এসে পালা লিখতে বসবেন কেন? ইতিমধ্যে তিনি নানান গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমাদের উপহার দিয়েছেন। ছোটোদের জন্য 'নালক', 'রাজকাহিনী', 'বুড়ো আংলা' লিখেছেন। ছোটোদের জন্য রামায়ণ রচনা করেছেন। আর বড়দের জন্য রেখেছেন বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধমালা। তিনি পালাতে বেশ আকৃষ্ট হচ্ছেন। আসলে তিনি যে লোক সংস্কৃতি চর্চার সাধক। তিনি মনে প্রাণে চেয়েছেন দেশজ সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার এবং হিতসাধন হোক। সেই কারণে লোকনাট্যকে তাঁর সাধনায় সামিল করে নিলেন। তিনি বুঝেছিলেন লোকনাট্যই পথ দেশজ শিল্পকে বাঁচানোর এবং তাঁর যে কর্ম উদ্যোগ তা সফল হবে। এখন এর সাথে সাথে একটা প্রশ্ন জাগে লোক সংস্কৃতিকে সহজ সরলভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যই কি তিনি ছোটোদের জগতে পা রাখলেন? নাকি তাঁর গভীর ভাবনার যথার্থ রূপদানে ছোটোরাই সমর্থ সেই কারণে তাঁর এই প্রয়াস। উত্তর কি হবে? এই প্রশ্নে উত্তর খুঁজতে— গেলে আমাদের অবনীন্দ্র গবেষনার আরো গভীরে যেতে হবে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর যুগে দাঁড়িয়ে একা একজন মানুষ যিনি ভারতীয় শিল্পী এবং পালাকার দুই সত্তার অধিকারী। তাঁর মতো সেকালে আর কেউ নেই। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর মতো করে পালা রচনা করছেন। তাঁর রচনার সাথে অন্য পালাকারদের মিল পাওয়া যায় না। সমসাময়িক পালাকাররা তাঁর থেকে হাজার হাত দূরে এবং তিনিও সমকালের সাথে মিশে যাবার কোনো ইচ্ছাই প্রকাশ করছেন না। এখন স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে সমকালের থেকে তিনি আলাদা হবেন কেন এবং কিভাবে? অথচ আমরা জানি তাঁর কোনো পালাই লোকসংস্কৃতির ধারার বাইরে নয়; লোক সাহিত্যে লোকগুণ নিহিত আছে সযত্নে। পালার সনাতনী কাঠামো তিনি অস্বীকার করছেন না। হ্যাঁ কোথাও কোথাও তার ব্যবহার হচ্ছে কাটছাট করে। আসলে পালা রচনাতে নিজস্ব অস্তিত্ব নির্মাণে সজাগ। এই সজাগ ব্যাপারটা কিভাবে আসছে?

শিল্পগুরু-অবনীন্দ্রনাথ বইতে বলছেন—

> প্লট পাবে কোত্থেকে? আমি কি প্লট ভেবে ভেবে লিখছি? ছোটো ছেলেমেয়েরা স্ফূর্তির সঙ্গে নাচবে, গাইবে, এইতো যথেষ্ট। প্লট দিয়ে আমার কি দরকার?

কেবল এই কথা থেকে সিদ্ধান্ত করা যাবে না কেন তিনি ছোটোদের পালাকার। আরো গভীরে না গেলে এর উত্তর পাওয়া যাবে না সঠিকভাবে। সে খোঁজ চালানোর আগে আমরা একটু দেখেনি সেই সময়তে জনজীবনে যাত্রার প্রভাব কেমন। সেখানে কি ছোটোদের

প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে নাকি তারা ব্রাত্য। ১৮৭১ সালে ৭ই আগস্ট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। তার আগে থেকেই অর্থাৎ ১৮১২ থেকে ১৮৭২, মোটামুটি ৬০ বছরের কালপর্বে ইংরেজী সংস্কৃতি এবং ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য বাঙ্গালী যুবকদের গজিয়ে ওঠা সংস্কৃতি যা শৌখিন থিয়েটার নামে ইতিহাসে পরিচিত এই দুয়ের মধ্যে টানাপড়েন চলতে থাকে এবং যার ফলে জাতির জীবনে এক অদ্ভুত সংস্কৃতির জন্ম হল। সে না হল খাঁটি ইংরেজী সংস্কৃতি আর না হল খাঁটি ভারতীয় সংস্কৃতি। ১৮১২ সালে তৈরী হল এথিনিয়াম থিয়েটার। ১৮১৩ সালে চৌরঙ্গী থিয়েটার। ১৮৩৯ সালে মাঁসুসি থিয়েটার। এর পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে সাতুবাবুর নাট্যশালা, নবীন বসুর নাট্যশালা, প্যারীমোহন বসুর জোরাসাঁকোর নাট্যশালা, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নাট্যশালা। সে আজ ইতিহাস। কলকাতার বাবু সম্প্রদায় ইংরেজী আদলে নিজেদের বাগানবাড়িতে শখের থিয়েটার চালু করলেও একদলবাবু উলটো পথে পা রাখলেন। তাঁরা থিয়েটার নয় যাত্রার পৃষ্ঠপোষক। যাত্রা বাণিজ্যিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। বিবর্তন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার যাত্রা শহুরে মানুষদের উপভোগ্য হয়ে শহরেই স্থায়ী ঠিকানা তৈরী করে ফেলল। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। যাত্রা বাণিজ্যিকভাবে টিকে গেল। থিয়েটারকে বাঁচতে হচ্ছে কিন্তু আজও যুদ্ধ করে। গিরিশ ঘোষ শিশির ভাদুড়ী থেকে আজকের মেঘনাদ কেউই আর্থিক সুখ নিয়ে থিয়েটার চালাতে পারেন নি। আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে যুদ্ধ করে পথ চলা।

> The problem of art is it has to do business for its existence. The problem of business is–when it deals in Art it imperils its existence. How a happy marriage between Art and business can be made possible that is a challenge to both Art & Bussiness
>
> (হরিমাধব মুখার্জী / নাটকের চোখে যাত্রা)

আমাদের দেশে একমাত্র যাত্রার পক্ষেই সম্ভব হয়েছে দুকূল রক্ষা করা। সেক্ষেত্রে সামাজিকভাবে এবং সাধারণ মানুষের রুটির প্রশ্নে যাত্রার বিশেষ গুরুত্ব আছে। সেদিন যাঁরা যাত্রাকে বাঁচানোর কথা ভেবেছিলেন, টিকিয়ে রেখেছিলেন তাঁদের প্রতি বিনম্র প্রণাম। জোরাসাঁকোর বীরসিংহ সাধকের যাত্রা, রাম চাঁদ মুখোপাধ্যায়ের যাত্রা গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যাত্রা শৌখিন যাত্রা নামে পরিচিত। আবার পেশাদার দল হিসাবে আমরা পাব দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (পাথুরিয়াঘাটা) ঝড়ু দাসের যাত্রা দলকে। কিন্তু কোথাও ছোটোদের নিয়ে ভাবা হচ্ছে না। জোরাসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে অবনীন্দ্রনাথের দাদু গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮২০-১৮৫৪)। এই বছর তাঁর জন্মদ্বিশতবর্ষ চলছে। তিনি বাড়িতে যাত্রার বাতাবরণ তৈরীর ব্যাপারে উদ্যোগী ছিলেন। নিয়মিত ঠাকুরবাড়িতে যাত্রার আসর বসাতেন। ঠাকুরবাড়ির আরেক কৃতী সন্তান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর যাত্রাপ্রীতির কথা জানিয়েছেন তাঁর 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে—

"আমাদের দেশের যাত্রা আমাদের এই জন্যে ভালো লাগে যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া ওঠে।"

রবীন্দ্রনাথের কোনো যাত্রা পালা নেই। রচনা করেছেন নাটক। শারদোৎসব থেকে রক্তকরবী অর্থাৎ ১৯০৮ থেকে সব নাটকেই যাত্রার ছায়া পাওয়া যাবে কোনো না কোনো ভাবে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র ঠাকুরদা, অন্ধ বাউল বা ধনঞ্জয় বৈরাগী এরাতো যাত্রার বিবেক চরিত্রের মতো। ঠাকুরবাড়িতে স্বল্প দিনের জন্য হলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথও—যাত্রা চর্চা করেছেন। তাঁর নাটক যাত্রার আদলে মঞ্চস্থ হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পারিবারিক যাত্রার বাতাবরণে বেড়ে উঠেছেন। ছেলে বেলা থেকে দেখতে দেখতে যাত্রা ব্যাপারটা কী তার একটা ধারণা নিজের মনের মধ্যে তৈরী করেছিলেন। তাঁর স্মৃতিকথাতে যাত্রার কথা পাই—

"অধিকারী আসতেন যাত্রার আসরে চাপকান পরে,
মাথায় শামলা জড়িয়ে বুকে গার্ড চেন ঝুলিয়ে।
জুড়িদের শুধু শাদা কাপড়ের ইজের আর চাপকান,
রাজাদের গালপাট্টা—মোড়াশা পাগড়ি—মন্ত্রিদেরও
তাই, খালি যা পাকা গোঁফ।... ছেলেরা সব পেশোয়াজ
আর নোলক পরে সখী সাজত মাথায় জরি দিয়ে
জড়ানো বিনুনি চুল। বুকে উকিলদের মতো করে
ওড়না জড়ানো তবে কারুর কারুর গোঁফ দাড়ি কামানো
হয়ে উঠতো না তাও দেখেছি।"

অবনীন্দ্রনাথের দেখার চোখ অসাধারণ। ঐ অল্প বয়সের দেখার যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তা একালের একজন পাঠককে পালার কর্মচারীদের সম্পূর্ণ ছবি বুঝে নিতে সাহায্য করবে। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখতেন। কার গোঁফ আছে কার গোঁফ থাকার দরকার নেই অবু আছে তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। আমাদের অবাক লাগে যখন দেখি তিনি বাস্তবে তাঁর পালা প্রযোজনাতে এসবের ধার ধারছেন না। তিনিও তাঁর পালাতে অধিকারী হচ্ছেন কিন্তু এ অধিকারীর সাথে সে অধিকারীর অনেক তফাৎ। অবনীন্দ্রনাথ এখান থেকেই তাঁর পালাকে আলাদা করে নিচ্ছেন। সময়ের পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে পালা নিয়ে তাঁর গবেষণা ও তার বাস্তব রূপদান তাঁর পালাকে অন্য পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁর পালার মধ্যে মাঠ পথের ছোঁয়া আছে। চেনা সুর। চেনা কাহিনী। সংলাপে সঙ্গীতে চেনা শব্দের ভীড়। তাঁর প্রযোজনাতে—বাঁধা ছক নেই বটে কিন্তু লোক শিল্পের গোপন সুরটা রয়েছে—পাকাভাবে। সেই কারণে তাঁর পালা আলাদা। ভাবনা আলাদা। তাঁর দৌহিত্র মোহনলাল বলছেন—

"দৃশ্যপট নেই, ফুটলাইট নেই, স্পট লাইট নেই, কিছু নেই, শুধু কথার মালা, গানের সুর আর অভিনয় ভঙ্গি দিয়ে দৃশ্যর পর দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা।"

আসলে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিস্তার ও ব্যাপ্তি অনেক। প্রথমত তিনি একজন শিল্পী। ছবি আঁকা ছবি দেখা তাঁর দখলে। তিনি জানেন ছবিকে কিভাবে জীবন্ত করতে হয়। রঙ তুলির আসরের বাইরে যে জীবন্ত ও চলমান ছবি দৃশ্যমান তাকে আরো সুন্দর আরো জীবন্ত করে তোলার কায়দা তিনি জানেন। লোকশিল্পকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় তিনি জানতেন। 'কাটুম কুটুম' তাঁর যাতে জীবন্ত হয়ে গেছে। তাঁর ছবির মধ্যেও আমরা দেশজ-সংস্কৃতির ছাপ পাব। তাঁর লোকশিল্প নিয়ে গবেষণার শেষ নেই। বলা যায় লোক শিল্প ও অবনীন্দ্রনাথ যেন সমার্থক শব্দ। যাত্রার কথাতে ফিরে আসি। তিনি যাত্রাপালা লেখার আগে যাত্রা সম্পর্কে তার জ্ঞান আহরণ করেছেন নানাভাবে নানাপথে। সময়কে দেখেছেন খুব কাছ থেকে। তিনি সময়কে ভালোভাবে বুঝেছিলেন বলেই সময়ের বাইরে পা ফেলার সাহস পেয়েছেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন উনিশ ও বিশ শতকের যাত্রার বৈশিষ্ট্য এবং এই দুই শতকের যাত্রার বৈশিষ্ট্যের ফারাক। উনিশ শতকে আমরা দেখছি প্রাচীন যাত্রার যে করুণ রস তা কমে যাচ্ছে তার বদলে জায়গা দখল করে নিচ্ছে শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজিডি, নাচ গান কমে গিয়ে সেখানে অভিনয় প্রাধান্য পাচ্ছে। আর বিশ শতকে যাত্রাতে আমুল পরিবর্তন ঘটছে অত্যন্ত দ্রুত লয়তে। পৌরাণিক মোহ ছেড়ে স্বদেশি প্রেমের প্রতিষ্ঠা। ঐতিহাসিক চরিত্র নয়, দেব দেবী বা মহাপুরুষের বদলে জায়গা করে নিচ্ছে সাধারণ মানুষ। সামাজিক সমস্যা স্থান পেল। মহামারী তার সাথে কালোবাজারী এসব ঘটনা গল্পের কেন্দ্রতে চলে এলো। এই বিবর্তন থেকে অবনীন্দ্রনাথের পালার পথ নির্মাণ। তিনি ভেবেছেন দেশজ সংস্কৃতি তাঁর হাতে কিভাবে সেজে উঠতে পারে। ১৯৩৪ সালে পালা রচনা পর্বে কোনো বৈশিষ্ট্যই তাঁকে ছুঁলো না। আশ্চর্যের বিষয় বিশ শতকের বৈশিষ্ট্য তাকে প্রভাবিত করতে পারে নি। তিনি যে লোক সংস্কৃতির গভীরে ডুব দিতে চান। তাই আমরা তাঁর পালাভাবনা নিয়ে গবেষণা করব। কারণ খুঁজব কেন তিনি পালাকে নিয়ে এভাবে ভাবলেন। এটা ঠিক সাধারণ জ্ঞান নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের মতো শিল্পী কোনো শিল্প সৃষ্টিতে মাতবেন না। তিনি যে সারা জীবন ধরে লোক শিল্পের গভীর রস অনুসন্ধান করেছেন তা তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে করেছেন। কখনোই ধার করা জ্ঞান বা অন্যের চোখ দিয়ে নয়। তাঁর শিল্প সম্পর্কে ভাবনা তাঁর 'মত ও মন্ত্র' প্রবন্ধে স্পষ্ট—

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যদ্য ন বেদ সঃ।
বিদ্যমান যে জগৎ তাকে প্রতিচ্ছবি দ্বারা বিদ্যমান করা মানে পুনরুক্তি দোষে নিজের আর্টকে দুষ্ট করা। বিদ্যমান জগৎ বিদ্যমানইতো রয়েছে, তাকে পুনঃ পুনঃ ছবিতে আবৃত্ত করে ড্রয়িং না হয় মানুষ পেলে, ছককে চিনতে শিখলে রং কে ধরতে শিখলে কিন্তু এ তো প্রথম পাঠ। এখানেই যে ছেলে পড়া শেষ করলে সে কি শিল্পের সবখানি পেলে? অথবা

মানুষের চেষ্টা তার কল্পনাতেই রয়ে গেল, অবিদ্যমান অবস্থাতেই সুখের স্বপ্নদর্শনের মতো হল ছেলেটির দশা। অন্ধের রূপ কল্পনার মতো অবিদ্যমানকে বিদ্যমানের মধ্যে ধরতে সক্ষম রইল সে নির্বাক ও চক্ষুহারা? একে বলে বাইরে বাঁধব, অন্যে রইল ভিতরে বাঁধা।"

যাত্রা পালা নিয়ে তিনি যে ভাববেন সেটাই তো স্বাভাবিক। চেনা ছবি তার পছন্দ হবে না তাই তাকে বারবার অন্য পথে চলতে হবে আর সে পথই হবে তার নিজস্ব ঘরানা। তখন সেই পালা আমাদেরকেও ঠেলে নিয়ে চলবে বিদ্যমান জগতের বাইরে পরে থাকা অফুরন্ত চারণভূমিতে। তিনি পেরেছেন বাঁধা ছকের বাইরে গিয়ে, পালাকে অন্যভাবে রচনা করতে। তাঁর দায় আছে—শিল্পের কাছে—দায় আছে নিজের কাছে। তিনি একটা কথা বুঝেছিলেন পালা কিন্তু মুক্ত সংস্কৃতি। জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে পালার ধারাবাহিক বিবর্তন ও পরিবর্তন হচ্ছে। সবটাই হচ্ছে মানুষের প্রয়োজনে। কখনো তা শিক্ষাদানে কখনো তা অস্তিত্বদানে। পালা যে আনন্দ দান করতে পারে সে ব্যাপারে ভাবা হল কোথায়? অবনীন্দ্রনাথ সে আনন্দর জায়গাই ধরলেন। লোকনাট্যের মূল সুরটাকে ধরে রেখে আনন্দ নির্মাণই তাঁর আসল কাজ হল। তার সাথে মিশিয়ে দিলেন শিশু শিক্ষাকে। ছোটো ছেলেরা আনন্দ করতে করতে জীবনের পাঠ নিল। তিনি নীতিকথা নিয়ে পালা রচনা করছেন—"দুই পথিক ও ভল্লুকের পালা", "কর্মদান পালা"। আবার রামায়ণ থেকে 'রাম বিবাহ', অযোধ্যা কাণ্ড পালা তৈরী হচ্ছে। এছাড়া তো রয়েছে কত মজাদার পালা। তিনি শুধু রামায়ণ বা মহাভারতের গল্প থেকে যাত্রা পালা রচনা করেননি। রাজশেখর বসু (পরশুরাম) রচিত লম্বকর্ণ তাঁর পালাতে এসেছে। এর সাথে কথা মালা হিতোপদেশের গল্প তো আছেই। তাঁর গীত রচনা আমাদের অবাক করে দেয়—

পেটে না খেয়ে গেঁজে ভরলাম
শেষকালে তাও গেল,
এর চেয়ে কিছু না থাকাই ছিল যে ভালো
(কঞ্জুষের পালা)

আমি এসেছি এই প্রভাতে, সারাটি রজনী জাগিয়া
তুহুঁ দেখিবারে মধু গীত শুনিবারে আশাতে বুক বাঁধিয়া
পথে আসিতে পথের মাঝে মাত্র গিয়েছিলাম
দাঁতন করিবার কাজে
তাই তোমার কণ্ঠবীণার মধু ঝংকার
অভিমানে কী স্তব্ধ রইল মধুবনের মাঝে।
(ধোড়া কাক বুড়ো শেয়ালের পালা)

তার গান রচনার মধ্যে কখনো নিজস্বতা আবার কখনো প্যারডি পাব। আবার মজার কথাও আছে। তাঁর পালার চরিত্ররা অদ্ভুত যেমন হিন্দ্রা, ঘৃতাচী, সিগনাল, ছাগলীবুড়ি, শৃগাল, কোকিল, মেটেভূত, জলসা ভূত, বনমানুষ, মর্কট, ইন্দুর, ঢেঁকি, পাপী, খালাসী

আরো কত নাম যে আছে। হাসি পায়। এরা সব চরিত্র। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সংলাপ রচনাতেও বেশ মজা আর হাস্যরস পুরে দিয়েছেন। সংলাপগুলো বলতে যেমন ছোটো ছেলে মেয়েদের মজা লাগবে তেমনি আবার বড়দেরও শুনতে ভালো লাগবে।

আত্মা ।। কী বললে? এ কি সত্যি না স্বপ্ন?

নহুষ ।। সত্যি সত্যি সত্যি

আত্মা।। আমি এই দিলাম উড়ান। বিশ্বাসঘাতক নহুষ, সুরের এই পর্বতের চূড়া থেকে দেখি আমি, কে তোমায় রক্ষা করে। (এসপার, ওসপার)

আত্মা।। আরে টানাটানি করো কেন

নহুষ।। এ যে দেখি একটা বয়া। বিষম পিছল— ধরো ধরো

(এসপার ওসপার)

নহুষ ।। এই! এই! এ যে জলে ভেসে যায় সব

আত্মা।। এ কী! কলের জলের বাধা ফাটল না কী?

নহুষ।। আরে না না। ভুল করে সোলেসানি তক্তি ঘসে ফেলেছি (স্বগত) চোরটা টিউবওয়েল খুঁড়ে ফেললে না কি।

আত্মা ।। আংটির তাহলে গুণ আছে বলো?

(এসপার ওসপার)

অবনীন্দ্রনাথের রচিত সংলাপের আরো উদাহরণ দেওয়া যায়। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ বইটিতে অবনীন্দ্রনাথ বলছেন

"কী করে যে এত লিখতে পারলুম তাই ভাবি। খাতাপত্র চুরিও হয়ে গেল। বারান্দায় টেবিলের উপর পড়ে থাকত খাতাগুলো, বাড়ি বদল করবার সময়ে দেখি একদিন সেসব উধাও।"

আমরা তঁর পালার সংকেত পাচ্ছি মাত্র ২৪ টি। তিনি এ সব যত্নে রাখা প্রকাশ করা এসব ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় কটা পালা ছাপা হল? তাঁর প্রয়াণের পর যাত্রাপালার প্রথম সংকলন প্রকাশিত হয়। কিছুদিন আগে শারদীয় আনন্দমেলাতে তার আরো একটি পালা 'পুতুল খেলুড়ির' কথা প্রকাশিত হয়েছে। পালা গবেষকরা অবনীন্দ্রনাথের পালা নিয়ে গবেষণা করবেন, তারা মত দেবেন আধুনিক সময়তে আজকে তাঁর পালা কত প্রাসঙ্গিক। পালার কি বৈশিষ্ট্য—কি ধরনের বৈচিত্র্য আছে যার জন্য অবনীন্দ্রনাথের পালা নিয়ে ভাবা যেতে পারে। বাংলার পালা মহলে পালাকার অবনীন্দ্রনাথকে কোন জায়গা দেওয়া যেতে পারে। এসব ভাবনা পালা গবেষকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যাক। গবেষকরাই ভাবুন।

অবনীন্দ্রনাথের পালাগুলি পড়তে পড়তে আমার বারবার মনে হয়েছে—তিনি বাঁধা ছককে তোয়াক্কা করেননি কখনোই। বরং একটা নতুন ছক আমাদের দিয়ে গেলেন। তিনি বলছেন—বিদ্যমান এই যে জগৎ চিত্র এর উৎপত্তিস্থল অবিদ্যমানের মধ্যে। অবনীন্দ্রনাথ

ঠাকুর তাঁর যাত্রা পালাতে সে সম্পর্কই করেছেন আজীবন। তাই তিনি আলাদা হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর পালা কোনো ভাবেই বাণিজ্যিক নয়। বাণিজ্য করার দায় নেই। সময়ের আধারে এইসব পালা নানান মাপের। পালাগুলিতে আছে তাঁর খেয়াল খুশির ছাপ। কাঠামোতে দেখবো কোনোটা পালা কোনোটা নাটক-যাত্রা পালা কোনোটা আবার কোনো দিকেই পড়ছে না। তিনি তাঁর পরিচ্ছন্ন নিরীক্ষা চালিয়েছেন ছোটোদের নিয়ে। ছোটোরা পেয়েছে অনাবিল আনন্দ। আমরা পেলাম অসাধারণ সম্পদ যেখানে আনন্দ আছে বিনোদন আছে মজা আছে শিক্ষা আছে আবার আমাদের লোক সংস্কৃতির গভীরে প্রবেশের পথও আছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পালা ভিন্ন গোত্রের বটে কিন্তু ফেলে দেবার নয়।